ভারত ও দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা : একটি রণনৈতিক দর্পণ

আবদুল কালাম*

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়াস প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বরে। এ সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর (South Asian Association for Regional Cooperation বা SAARC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অঞ্চলব্যাপী সহযোগীতার ধারণা প্রচার ও জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে বাংলাদেশ উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৭৭—১৯৮০ এর দিকে। এতে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া মেলে এ অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত ছোট দেশগুলো থেকে, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান শক্তি, ভারত এ পর্যায়ে সতর্কতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ; এমনকি ভারতের অনেকটা শীতল মনোভাবও ব্যক্ত হয়। পরবর্তীতে অবশ্য ভারতও এ অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতই সহযোগিতার ব্যাপারে উষ্ণ আগ্রহ প্রদর্শন করে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বাবধি ভারতের প্রধানমন্ত্রী সার্কের সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। তা সত্ত্বেও এ অঞ্চলে ভারতের সার্বিক সম্পর্কের আলোকে তার আঞ্চলিক ভূমিকা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, প্রয়োজন আরো প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলো এ ভূমিকা কিভাবে দেখে আসছে সেই কারণে। এ প্রবন্ধে ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি কৌশলগত রণনৈতিক ফ্রেম বা কাঠামো ব্যবহার করে এরূপ যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, ভারতের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিক অপ্রতিসম সম্পর্ক গভীর প্রবণতা আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিসাম্য ভিত্তিক বহুজাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে

* আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলছে। প্রবন্ধে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ভারতের রণনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিলক্ষিত সহযোগিতা পরিপন্থী এসব উপাদান পরিত্যক্ত না হলে আঞ্চলিক সহযোগিতার পক্ষে যথার্থ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে না।

সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে কৌশলগত ফ্রেম বা কাঠামোর ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের দ্বান্দ্বিক আচরণ বা সহযোগিতামূলক কর্মসূচী পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত করা সম্ভব। কৌশলগত চিন্তাধারা অবশ্য নতুন নয়।[১] কৌটিল্য, ম্যাকিয়াভেলী ও ক্লজভিৎসের লেখায় কৌশলগত বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক পরিচয় মেলে, যদিও তাঁদের বক্তব্যে অপ্রতিসম ভাবধারা ও ধ্রুপদী বা সনাতন পন্থী চিন্তা চেতনা পরিস্ফুট হয়। কিন্তু সমকালীন রণনৈতিক ফ্রেমে গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় প্রতিসম বিবর্তনের প্রতিফলন ঘটতে হবে।

'রণনীতি' বা 'strategy' প্রত্যয়টির উৎপত্তি হয় সমর অধিনায়ক বা জেনারেলদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গ্রীক প্রতিশব্দ 'strategus' থেকে। এর অর্থ অধিনায়কদের ব্যবহৃত কলাকৌশল। সাধারণভাবে সেনা বাহিনীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সংগঠিত করে নেতৃত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মসূচী থেকে যুদ্ধ শুরু অবধি প্রভৃত কার্য-কলাপের মাধ্যমে শত্রু পক্ষকে বিপাকে ফেলার সার্বিক পরিকল্পনা রণনীতির ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] বর্তমানকালে রণনীতি সম্পর্কিত বিশ্লেষকবৃন্দ রাজনৈতিক ও সামরিক আশা-আকঙ্খার বিভিন্ন পর্যায় বা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণে 'কৌশলগত' বা 'রণনৈতিক' ('strategic') শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। রণনৈতিক কাঠামোতে চার পর্যায়ের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হতে পারে ঃ উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে 'নীতি' (Policy), তারপর পর্যায়ক্রমে 'মহারণনীতি' (grand strategy'), 'রণনীতি' (strategy) এবং সবশেষে 'রণকৌশল' ('Tactics')। রণনীতি অনেক সময় যুদ্ধদ্বারা আবেষ্টিত, রণকৌশলও একই বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মহারণনীতি যুদ্ধ চলাকালের পরিধি অতিক্রম করে যুদ্ধোত্তর শান্তির প্রতিও দৃষ্টি রাখবে— এই হচ্ছে নিয়ম। মহা রণনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি জাতির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে জাতির সার্বিক ধন সম্পদ সমন্বয় ও পরিচালিত করা। এতে জাতীয় নীতির লক্ষ্য সংজ্ঞাগত রূপ ধারণ করে, রাষ্ট্রের যে নীতি কার্যকর

বা বাস্তবায়িত হতে চলছে সেই অর্থই ব্যক্ত হয়ে থাকে। এই দৃষ্টি-কোণ থেকে, রণনীতি হচ্ছে এমন এক 'কলা' ও 'বিজ্ঞান' বিশেষ যার ব্যবহার এবং প্রয়োগের মাধ্যমে একটি জাতির রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, মনস্তাত্ত্বিক শক্তি ও সামর্থ্য জোরদার করার পাশাপাশি যুদ্ধ চলাকালে বা শান্তিকালীন সময়ে জাতীয় উদ্দেশ্যাদি অর্জন করা যায়। রণকৌশল হচ্ছে রণনীতির প্রয়োগে নিম্নতর স্তর বা পর্যায় বিশেষ, যদিও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বেশ অস্পষ্ট। কেননা যুদ্ধ-দ্বন্দ্বের এ দুটি উপায়ের একটি অপরটিকে শুধুমাত্র প্রভাবিত করে না, উভয়ে বাস্তব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সংমিশ্রিতও হয় বটে।

এ বিষয় সম্পর্কে আরেকটি প্রসঙ্গও প্রণিধান যোগ্য। যুদ্ধ দ্বন্দ্বরত দু'টি রাষ্ট্র যখন মহারণনীতি অর্জনে অঙ্গীকার বদ্ধ হয় এবং এ স্থির লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার করে সামরিক কৌশলগত ক্ষমতা তখন শান্তি সংস্থাপন বা সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার প্রতি বিবদমান উভয় পক্ষের শূণ্যমান রণনীতি ('Zero-sum' strategy) প্রকাশ পায়। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থবহ সহযোগিতা সম্ভব হয় না; বরং পারস্পরিক সম্পর্কে সৃষ্টি হয় অচলাবস্থা, এমনকি সামরিক সংঘর্ষও বিচিত্র নয়। সংক্ষেপে, কৌশলগত চিন্তাধারার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের নীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাদি পর্যালোচনা করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহীত মহারণনীতি, রণনীতি ও রণকৌশল চিহ্নিত করা এবং বিকল্প উপায় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা।

এখন দেখা যাক ভারত ও প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে কি ধরনের কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে এবং পরস্পরের প্রতি তাদের রণনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ? বিগত প্রায় সাত বছর অবধি দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ আঞ্চলিক ভিত্তিতে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত সাফল্য সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে।[৪] দক্ষিণ এশিয়া এমন একটি অঞ্চল যাতে অভিন্ন হুমকি প্রসূত কৌশলগত সমঝোতা নেই বললেই চলে; বরং বলা যায়, এ অঞ্চলে অভিন্ন হুমকি জাত সচেতনা রয়েছে শুধুমাত্র তাদের নানারূপতা বা বিচিত্রতায়। প্রসঙ্গটি সম্ভবত আরো কিছুটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। প্রথমত, দক্ষিণ এশিয়ার অভ্যন্তরীণ হুমকি হচ্ছে বহু ধরনের এবং এসব প্রায় প্রতিটি

হুমকির ক্ষেত্রে কোন না কোন ধরনের আঞ্চলিক ইন্ধন রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর প্রতি বাহ্যিক হুমকির মূলে প্রায়শ প্ররোচনা আসে সার্কভুক্ত অন্য কোন দেশ থেকে এবং প্রধানত আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের কারণে এ অঞ্চলে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দেখা দেয়। দক্ষিণ এশিয়ায় কৌশলগত সমঝোতার অভাব এবং সার্কের অনগ্রসরতা উভয়ই সম্ভবত উপযুক্ত দু'টি কৌশলগত আঞ্চলিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত।[৫]

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় খুব স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে—তা হলো আয়তন ও জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও আর্থিক অবস্থা, প্রযুক্তি ও সামরিক যোগ্যতার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপক অসম অবস্থা বিরাজ করছে। এখানেই নিহিত রয়েছে এ অঞ্চলের কৌশলগত উদ্বেগের প্রধান কারণ। কেননা এর ফলে স্পষ্টতই বৃহত্তর আঞ্চলিক শক্তির আধিপত্য বিস্তার সম্পর্কে আশঙ্কা জন্মে কিংবা কিছুটা অস্পষ্ট হলেও আঞ্চলিক নেতৃত্ব লাভে অভিলাষী দুটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শক্তির প্রভাব বলয় সম্প্রসারণে দ্বি-কেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সম্ভবত অন্য যে-কোন অঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ এশিয়াকে ভিন্নতর বলে মনে হয়, কেননা এর 'কেন্দ্র' ('Core') একটি মাত্র রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এ রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত। 'প্রান্তে' ('Periphery') অবস্থিত রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক নেতৃত্ব লাভে প্রয়াসী রাষ্ট্র পাকিস্তান, রয়েছে মাঝারি শক্তি সম্পন্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ, ক্ষুদ্রতর দু'টি শক্তি নেপাল ও শ্রীলঙ্কা এবং পরিশেষে দুটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভূটান ও মালদ্বীপ।[৬] দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রস্থ শক্তিরূপে ভারতকে চিহ্নিত করার অর্থ এ নয় যে ভারতই হচ্ছে এ অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু; কেননা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য এরূপ প্রস্তাবনার অর্থ দাঁড়াতে পারে—ভারতের কৌশলগত লেজুড়বৃত্তি। বস্তুত, প্রতিটি দেশের বিশ্ব-কৌশলগত ভাবনা এরূপ যে স্বদেশকে সবাই দেখে কেন্দ্রবিন্দু বলে, আর বাদবাকী বিশ্বকে দেখে তার চারপাশে। দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রকৃতির জাতীয় আচরণ আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার পরিপন্থী নয়। বরং এসবের ফলে একে অপরকে পারস্পরিক শক্তিতে বলীয়ান করতে পারে, আর তাই স্বদেশভিত্তিক এসব মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির প্রতি বিরাগ ভাব প্রদর্শন

করা সমীচীন হবে না।[৭]

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সবই সার্বভৌম। এরূপ দাবি তাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় স্বত্বার ভিত্তি। তবু বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এসব রাষ্ট্রের মধ্যে দুটো, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ, হচ্ছে মূল ভারতের উপাঙ্গ এবং ভারত ছাড়া এ অঞ্চলের বাকী ছয়টি রাষ্ট্র সর্বমোট ভূ-সীমানা ও জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের এক তৃতীয়াংশের চেয়েও কম। উল্লেখ্য, এ অঞ্চলের শতকরা ৭২ ভাগ ভূমি এবং জনসংখ্যার শতকরা ৭৭ ভাগ ভারতের অংশে। স্থায়ী কৃষি কাজের উপযোগী জমির শতকরা ৮৫ ভাগ এবং সেচধৌত জমির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই ভারতের। এভাবে ভারত অন্যান্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর চেয়ে শুধু বড়ই নয়, বাদবাকী রাষ্ট্রের সর্বমোট আয়তন-পরিমাণের চেয়েও অনেক বড়।

উপরন্তু, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ছাড়া অন্য ছ'টি রাষ্ট্রের অভিন্ন সীমানা নেই। অথচ ভারতের সঙ্গে চারটি দেশের অভিন্ন ভূ-সীমা রয়েছে, দু'টির রয়েছে জলসীমা। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। উপযুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার আরেকটি বিশেষত্ব—এর দৃশ্যতঃ অপ্রতিসম শক্তি কাঠামো। এসবের ফলে এ অঞ্চলে ভারতের প্রাধান্য প্রকাশ পায়। এ প্রাধান্য শুধু জনসংখ্যা, আয়তন ও সম্পদের কারণে নয়; অর্থনৈতিক প্রসার, সামরিক শক্তির বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণেও।[৮]

উপরে উল্লেখিত সব ঐতিহাসিক বাস্তবতা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান এ ইঙ্গিত বহন করে যে, ভারতের কৌশলগত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অন্তর্নিহিত জাতীয় শক্তি, তার চিরায়ত সামরিক শক্তি ও সম্ভাব্য কৌশলগত শক্তির দিক বিবেচনা করে ভারতীয়দের প্রায় সবার পক্ষে ভারত-ভিত্তিক একটি দক্ষিণ এশীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এ অঞ্চলে ভারতের 'বৈধ' রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সপক্ষে যুক্তির অবতারণা করা অমূলক হবে না। অবশ্য ভারতের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা বৈপরীত্য বা দ্বৈতভাব বিদ্যমান।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ প্রায়শঃ বিশ্ববাসীকে এ বলে আশ্বস্ত করেন যে,

"বৃহৎ, ক্ষুদ্র বা কোন ধরনের শক্তি হবার কোন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ভারতের নেই—প্রতিবেশী দেশগুলোর ব্যাপারে কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করতে [ভারত] ইচ্ছুক নয়।"[৯] তবু বহির্বিশ্বে এবং এ অঞ্চলে ভারতের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা বলা চলে যে, ভারতের পররাষ্ট্র নীতি কৌশলগত পর্যায়ক্রমের সুনির্দিষ্ট অভিলাষপূর্ণ বেষ্টনী দ্বারা পরিচালিত। বিশ্ব কৌশলগত মানচিত্রে ভারত তার রণনৈতিক গুরুত্ব দেখে ইউরোপ ও এশিয়ার পার্শ্বস্থ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে, আর তাই একজন ভারতীয় বিশ্লেষক এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপিত করেন যে, "কিছু কিছু রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ভারত বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের রণনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিতে পারে।"[১০] তাই আঞ্চলিকভাবে ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় এমন একটি মহারণনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট যাতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের কর্তৃত্ব সুসংহত হয়। এরূপ লক্ষ্য অর্জনে ভারত "আন্তঃনির্ভরশীলতা" (inter-dependence") রণনীতি বাস্তবায়নে সক্রিয়।[১১] বিশ্ব পর্যায়ে ভারত তার অভিলাষ উন্মুক্ত রাখতে প্রয়াসী, যাতে শক্তিধর "ভারত মানব জাতির সেবায় বিশ্ব রাজনীতির পুরোভাগে স্বীয় আসন লাভ করতে পারে।"[১২]

এভাবে "আন্তঃ নির্ভরশীলতা" রণনীতি গ্রহণ সত্ত্বেও এ অঞ্চলে ভারতের বাস্তব অবস্থান ও আচরণ এবং এসবের পাশাপাশি ভারতের বিশ্ব অভিলাষ—সবকিছু মিলিয়ে নয়াদিল্লী এমন একটি ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে যে ভারতকে আধিপত্যবাদী আশা-আকাঙ্খার দায়ে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। ভারত সার্কের পটভূমিতে যথার্থই যদি এরূপ কৌশলগত দৃষ্টি-ভঙ্গি গ্রহণ করে তবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে গৃহীত যে-কোন সহযোগিতা-মূলক প্রয়াসে ভারতকে একক-ভাবে 'ভিটো' প্রদান বা নাকচ করার ক্ষমতার অধিকারী করতে পারে। এরূপ কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থার অন্যান্য রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য ভারতীয় আধিপত্য প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বহিঃশক্তির সমর্থন লাভের প্রচেষ্টায় প্ররোচিত করতে পারে। তাই দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার যে কোন মডেল হতে হবে আর্থনীতিক, সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরিব্যপ্ত প্রতিসম মডেল।

এ হচ্ছে প্রতিসম আশা-আকাঙ্খা অনুসৃত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এ

ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ না হলে আঞ্চলিকভাবে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে অপ্রতিসম প্রাধান্য ও হুকুমাধীন, আদেশ-নির্দেশমূলক উপাদান তিক্ততা সঞ্চার করতে পারে। ঐতিহ্যগতভাবে এ অঞ্চল বহু অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত। ফলে এ অঞ্চলের কৌশলগত দৃশ্য স্থির অবিশ্বাসের ছোঁয়াচে আড়ষ্ট। ভারতের কেন্দ্রস্থ অবস্থান, এর বিশাল আয়তন ও ব্যাপকতর শক্তির কারণে সার্কভুক্ত পার্শ্ববর্তী দেশগুলো প্রায় অনবরত ভারত ভীতিতে সন্ত্রস্ত। দৃশ্যমান ভারতীয় ধারণা যে এ অঞ্চলের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলো তার নিরাপত্তা বলয়াধীন এবং তাই এসব দেশকে অবশ্যি ভারতীয় "নিরাপত্তা স্বার্থ সংরক্ষণে ভারতীয় কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে, থাকতে হবে ভারতীয় কোটরাধীন।"[১৩] এ সবের ফলেই প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ভারত ভীতি সঞ্চার হয়।

বস্তুত, বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক বিষয় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সম্পর্ক বিষিয়ে তুলছে। এর মধ্যে কিছু বিষয় অতীতকালের দ্বন্দ্ব জনিত এবং কিছু বিষয় ভবিষ্যৎ সুসম্পর্কে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। ভারত-পাকিস্তান, ভারত-বাংলাদেশ, ভারত-শ্রীলঙ্কা ও ভারত-নেপাল সম্পর্ক পারস্পরিক দ্বিপাক্ষিক, বহুমুখী গভীরতর দ্বন্দ্বের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন। এ অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর বিভিন্নতর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি জাতি গঠন নীতি কৌশলের অংশবিশেষ হিসেবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের আলোকে বোঝা যেতে পারে। কিছু প্রধান প্রধান সমস্যা এবং কিছু অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কিন্তু সতত পরিলক্ষিত সমস্যা তাদের সম্পর্কে জটিলতা সৃষ্টি করে চলেছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে সীমানাগত সমস্যা, অভিন্ন ধনসম্পদ ও নদনদীর পানির হিস্যা ও বন্টন, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও অর্থনৈতিক আধিপত্য নিয়ে পারস্পরিক ভয়ভীতি ও আশঙ্কা— এ জাতীয় বিষয়াদি ভারত ও তার ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে চলছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় সার্ক ভিত্তিক সহযোগিতামূলক বিবর্তনের প্রতি সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি আসছে ভারত পাকিস্তান অহিনকূল সম্পর্কের কারণে। ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষের ভাগাভাগি এবং দু' দেশের জন্ম-লগ্ন থেকে প্রতিবেশী এ দুটি দেশ একটি শূণ্যমান রণনীতির খেলায় মত্ত, একে অপরকে যেন দেখছে যুদ্ধরত প্রতিযোগী হিসেবে, যাতে

সুযোগমত একে অপরের ওপর আঘাত হানতে পারে। তথাকথিত 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে এ সময়ে ভারত বর্ষের ভাগাভাগি নয়াদিল্লী অপরিহার্য চাল হিসেবে মেনে নেয়, কিন্তু বহু ভারতীয় বিশ্বাস করতো যে নতুন মুসলিম রাষ্ট্র হবে ক্ষণস্থায়ী এবং ভারত মাতৃভূমি "তার অপসৃত সন্তানদের আবার কোলে ফিরে পাবে।"[১৪] এরপর থেকে ভারত শুধু তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত কল্পে সচেতন প্রচেষ্টাই চালিয়ে আসেনি, তার জনসংখ্যা, আয়তন এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সাথে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক সিস্টেমে ভারত যথাযথ শক্তি অবস্থান লাভেও প্রয়াসী হয়।[১৫] স্বাধীনতা লাভের পর পরই বিশ্ব রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ভারত লিপ্ত হয় একটি প্রধান শক্তি কেন্দ্রে পরিণত হবার প্রয়াসে, দখল করে প্রায় সব রাজন্য প্রশাসিত রাজ্য, জোরদার করে এ উপমহাদেশে তার অবস্থান। ফলে ভারত ভীতি পাকিস্তানের মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই ১৯৫০-এর দশকের দিকে পাকিস্তান সুযোগ মত মার্কিন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা মৈত্রী জোটগুলোতে যোগদান করে। পরাশক্তির ওপর ভর করে হলেও পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল এ উপমহাদেশে 'শক্তি ভারসাম্য' অর্জন করা।[১৬] অবশ্য বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পাকিস্তান কম্যুনিস্ট মতবাদের ভয়ে তেমন ভীত ছিল না, কিন্তু কম্যুনিস্ট ভীতির হিড়িকে সম্ভাব্য ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান মার্কিন নিরাপত্তামূলক ছত্রছায়া লাভের প্রত্যাশা করে।[১৭]

এভাবে, আইয়ুব খানের ভাষায়, পাকিস্তান "এশিয়ায় মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয় আমেরিকার একান্ত অনুগত মিত্র হিসেবে।"[১৮] ফলে পাকিস্তানকে ভারত দেশে বেনামী ভূমিকায় অবতীর্ণ এক শত্রুদেশ হিসেবে। কৌশলগত পাল্টা চাল হিসেবে ভারতও ঝুঁকে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে।[১৯] ফলে ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হয় এবং এসবের চূড়ান্ত ফসল হিসেবে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাক্ষরিত হয় (৯ আগস্ট ১৯৭১) ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর ভারত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতের সম্ভাব্য আধিপত্য ও কর্তৃত্বের ভয়ে ভীত পাকিস্তান তার নিজস্ব শক্তির ভারসাম্য রক্ষাকল্পে চীন মার্কিন অব্যাহত সহানুভূতি ও সাহায্য লাভের প্রয়াস

চালিয়ে আসে। প্রকৃত পক্ষে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ে পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুপ্রতিম সাহায্য ও সমর্থন যুগিয়ে চলে।[২০]

ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে বর্তমানে অবশ্য বাহ্যত জোট নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ধারণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয় রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক শক্তিদাবার চালের ঘুটিতে রূপান্তরিত। উভয় দেশের এরূপ কৌশলগত পরিণতি তেমন বড় ধরনের মৌলিক রাজনৈতিক বা আদর্শগত পার্থক্যের কারণে নয়। বরং এ ধরনের অবস্থার পেছনে সতত ইন্ধন যোগাচ্ছে কাশ্মীরকে ঘিরে উভয়ের বিরোধ ; একে অপরকে নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দায়ে অভিযুক্তও করে চলছে। শুধু তাই নয়, উভয় দেশ তাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিরাট অংশ কাশ্মীরের সীমানা প্রান্তে নিয়োজিত রাখে। উল্লেখ্য, ১৯৪৭, ১৯৬৫, এবং ১৯৭১-এর এই তিনটি প্রধান ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে কাশ্মীর সর্বদা ছিল একটি রণাঙ্গন। অবশ্য ১৯৭২ সনে স্বাক্ষরিত সিমলা চুক্তি অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর যুদ্ধ বিরতির নিয়ন্ত্রণ সীমারেখা মেনে চলতে সম্মত হয়—এতে পক্ষ দু'টির নিজ নিজ নিয়ন্ত্রিত অবস্থানের ওপর কোনরূপ প্রভাব পড়বে না এবং কোন পক্ষ তাদের মধ্যে পারস্পরিক মত পার্থক্য এবং আইনগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও আপন অবস্থান পরিবর্তন করবে না বলে রাজী হয়।[২১]

অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত তার পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যে শিখদের একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অভিযানের প্রতি পাকিস্তানের সক্রিয় সাহায্য সম্পর্কে অভিযোগ করে আসছে। অন্যদিকে ইসলামাবাদ সন্দেহ পোষণ করছে যে, ভারত তার অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সম্পর্কে অনাদৃত পাকিস্তানকে ফাঁসাতে সচেষ্ট। এছাড়া, পাকিস্তানের গভীর বিশ্বাস যে, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অসন্তোষের পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে ভারতের সাহায্য ও সহানুভূতি।

ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের অধিকতর বিপজ্জনক দিক হচ্ছে তাদের অব্যাহত অস্ত্র প্রতিযোগিতা। ভারত যে কোন ব্যাপক আকারে অস্ত্র-ভাণ্ডার গড়ে তুলছে পাকিস্তান তার কোন যৌক্তিকতা মেনে নিতে অনিচ্ছুক। কেননা ভারত ইতিমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরেই চতুর্থতম শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর অধিকারী দেশ। ভারত যেহেতু তার রণদক্ষতা উন্নয়নকল্পে বেশ মোটা পরিমাণ অঙ্কের

অর্থ ব্যয় করে চলছে সেহেতু বেশীর ভাগ পাকিস্তানী দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্যবাদী প্রবৃত্তি সম্পর্কে সন্দিহান।[২২] প্রকৃত প্রস্তাবে পাকিস্তান ভারতকে তার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে আসছে, আর তাই ইসলামাবাদ পশ্চিমা সূত্র, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য সরবরাহ লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ভারত যদিও বিভিন্ন স্থল থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে তবু সোভিয়েত ইউনিয়নই হচ্ছে তার সরবরাহের প্রধান উৎস। পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে সাম্প্রতিককালীন ভারত-পাকিস্তান অস্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা অতীতের সব পরিসংখ্যান ছাড়িয়ে গেছে।

ভারত-পাকিস্তান অস্ত্র প্রতিযোগিতার সবচেয়ে মর্মস্পর্শী দিক হচ্ছে উভয়ের পারমানবিক কর্মসূচী ও সম্ভাবনা। ভারত তার প্রথম আনবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় ১৯৭৪ সনের অক্টোবরে, এভাবে বাস্তবায়িত করে "পারমানবিক শক্তিতে পরিণত হওয়া" সম্পর্কিত তার বাসনা।[২৩] শোনা যায় যে, ভারত বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপন্নে ব্যবহৃত পদার্থ প্লুটোনিয়াম যে পরিমাণে উৎপাদনে সমর্থ তাতে ইচ্ছে করলে প্রতি বছর ২০টি পারমাণবিক বোমা উৎপাদন করতে সক্ষম।[২৪] ভারতের পারমাণবিক নীতির এ ধরনের বিবর্তন তার বিশ্ব-পরিব্যপ্ত ভাবমূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; কেননা, এতে ভারতের পক্ষে তার পারমাণবিক নীতি "উন্মুক্ত রাখা সম্ভব হতে পারে, যাতে ভারত [বিশ্বের] পারমানবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধ ও সার্বজনীন নিরাপদমূলক শর্তাদি মেনে নিতে সম্মত করাতে পারে", বলেন এক ভারতীয় রণনীতিক।[২৫] পারমাণবিক প্রযুক্তির কতকগুলো দিকে ভারত পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে গেছে বটে, এতে পাকিস্তান ভারতের সম্ভাব্য কর্তৃত্বের ভয়ে আরো সন্ত্রস্ত এবং এ কারণে পাকিস্তান পারমাণবিক ক্ষেত্রে তার অনগ্রসরতার বাধা অতিক্রম করতে সচেষ্ট, বিশেষ করে ইউরেনিয়াম উন্নত করণের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান লাভেও তৎপর। এই পারমাণবিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও পাকিস্তান কর্তৃক এ ধরনের 'পাল্টা ভারসাম্য রণনীতি' ('Counter balance strategy') গ্রহণের ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে আরো তিক্ততা সঞ্চার হয়।

সম্ভবত ভারত পাকিস্তানের পারমাণবিক অভিলাষকে তার আঞ্চলিক বিশ্বাস যোগ্যতার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে। পারমাণবিক ক্ষেত্রে

ভারতের বিশ্বজনীন ভাবমূর্তি গ্রহণ সত্ত্বেও ভারত-পাকিস্তান পারমাণবিক প্রতিযোগিতার একটি মৌলিক উপাদান হচ্ছে যে, তাদের পারমাণবিক অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন শুধু পরস্পরের বিরুদ্ধে। তবে উভয়ে যখন পারমাণবিক অস্ত্রলাভের গণ্ডী অতিক্রম করবে তখন আর কিছুই তাদের সম্মুখে বড় বাধা হয়ে দেখা দেবে না এবং পারমানবিক অস্ত্র উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাধ্য বাধকতার কারণে উভয়ে সম্ভবত পুরোপুরি পারমাণবিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার অপ্রতিরোধ্য বাসনার স্রোতে ভেসে যাবে। পারমাণবিক নিবারকের যৌক্তিকতা এবং এর ফলশ্রুতিতে একই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভে উভয়ের সম্ভাব্য স্পৃহা সেক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক স্পৃহাকে নিস্তেজ করে দিতে পারে।

পরিহাস এই যে, ভারত ও পাকিস্তান তাদের অব্যাহত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তিক্ত সম্পর্কের কারণে দেখছে না যে, কিরূপ অভিন্ন হুমকি তাদের প্রতি এবং একই সঙ্গে এ অঞ্চলের প্রতি ত্রাস সৃষ্টি করতে চলছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সামরিকীকরণ থেকে এই ত্রাসের সম্ভাবনা। ভারতের বিশ্বাস যে, পাকিস্তান আফগান সংকটকে মূলধন করে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন মৈত্রী ব্যবস্থার মতো এখনো ভারতের বিরুদ্ধে তার আপেক্ষিক শক্তি অবস্থান জোরদার করার প্রয়াসে লিপ্ত।[২৬] কিন্তু ভারত যেহেতু বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আশা-আকাঙ্খায় অভিলাষী এ অঞ্চলের প্রধান শক্তি সেহেতু স্বাভাবিক কারণে এ অঞ্চলে যে কোন বহিঃশক্তির রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা সামরিক শক্তি প্রবর্তিত হলে ভারতের আঞ্চলিক প্রতিযোগীতার চেয়ে তার নিজেরই অবস্থানের প্রতি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হুমকি দেখা দেবে। কিন্তু ভারতের কাছে যেন বাইরের শত্রুর হুমকির চেয়ে পাকিস্তানকে বাগ মানানোই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

এবার ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপের সম্পর্কের বিষয়ে আসা যাক। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর এসব আঞ্চলিক শক্তিগুলো পরাশক্তি বা অন্য কোন শক্তির সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক রক্ষা করে চলে না। এসব দেশের পররাষ্ট্রনীতির গভীরতর উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা তাদের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ। কিন্তু তাদের

কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বা প্রাকৃতিক দুর্বলতার কারণে তারা মারাত্মক বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। এসব বাধা-প্রতিবন্ধকতা বাংলাদেশ সহ ক্ষুদ্রতর শক্তিগুলো পরিবর্তনশীল রণনীতি ও বহুমুখী বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মোকাবেলায় সচেষ্ট।[২৭] তবু ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্ভবত তাদের বৈদেশিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। কেননা এ অঞ্চলের সুবিশাল কেন্দ্রদেশ ভারত তাদের বন্ধু, পথ-প্রদর্শক, নিরাপত্তা বিধায়ক হিসেবে বিশেষ ভূমিকার দাবিদার, যদিও অনেকের নিকট এরূপ দাবি অপ্রতিসম আশা-আকাঙ্খা প্রসূত।

প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সম্ভবত বাংলাদেশ অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে ভারতের প্রতি অধিকতর কৃতজ্ঞতার নাগপাশে আবদ্ধ, কেননা অনেকের দৃষ্টিতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। ১৯শে মার্চ ১৯৭২-এ স্বাক্ষরিত ২৫ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি সম্পাদন করে উভয় দেশ এরূপ ভাবমূর্তি অধিকতর প্রসারে সচেষ্ট হয়। বস্তুত, বাংলাদেশ—ভারত সম্পর্কের 'সোনালী' দিনগুলোতে, স্বাধীনতার অব্যবহিত দু'বছর অবধি, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য ভিত্তি ছিল ভারতের সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক সুসংহত করা।[২৮] সম্ভবত ভারতের নিকটও ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর ছিল একটি পরম গৌরব এবং আনন্দের বিষয়, কেননা এ চুক্তিতে উভয় দেশের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি সমন্বয়ের বিধান রাখা হয়। এর চেয়েও বড় কথা, এ চুক্তি হচ্ছে ভারতের 'আন্তঃনির্ভরশীলতা' রণনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কিন্তু বাংলাদেশে অনেকে এই চুক্তিকে দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তিত শক্তি কাঠামো এবং আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে "ভারতের আপন স্বার্থোদ্ধারের পূর্ব পরিকল্পিত ভারতীয় প্রয়াসের" অংশ বিশেষ বলে মনে করে।[২৯] ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে অচিরেই ফাটল ধরে, সঞ্চার হয় তিক্ততা। বিশেষ করে বাংলাদেশে আগস্ট—১৯৭৫-এর ক্ষমতার পট পরিবর্তন হওয়ার পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের গভীর কালো ছায়া পরিলক্ষিত হয়। তবু বলা অমূলক হবে না যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াজাত উপাদান হিসেবে ভারতের উপস্থিতি ও প্রভাব

অন্য যে-কোন উপাদানের চেয়ে প্রকট। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে এ জাতীয় ধারা যথার্থ তুলে ধরেন একজন প্রজ্ঞাবান বিশ্লেষক ঃ বাংলাদেশে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে অতি ভারত-পন্থী যে-কোন সরকারকেও তার ভারত-প্রীতি প্রদর্শন থেকে যথেষ্ট সতর্কতা বজায় রেখে চলতে-হবে ; পক্ষান্তরে কট্টর ভারত-বিরোধী যে-কোন সরকারের পক্ষেও ভারত বিরোধিতা কিছুটা নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমিত রেখে চলা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে না।[৩০]

বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বেশ কিছু অমীমাংসিত, বিবদমান বিষয় সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করে চলছে। এসবের মধ্যে রয়েছে অভিন্ন নদনদীগুলোর পানির হিস্যা নিয়ে বিবাদ। উভয় দেশের মধ্যে এ হচ্ছে সবচেয়ে স্থির সমস্যা। ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মনে করে যে, উজান দেশ ভারত প্রায় সব বড় বড় নদ-নদীগুলোতে একতরফাভাবে বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাদেশের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলাদেশের দৃষ্টিতে, এসব বাঁধ দ্বারা ভারত শীত ও শুকনোর মওসুমে বাংলাদেশকে তার প্রাপ্য পানির ভাগ থেকে বঞ্চিত করছে, অথচ বর্ষার মওসুমে ভারত বাঁধের দ্বার উন্মুক্ত করে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশকে বন্যায় প্লাবিত করছে। ১৯৭৫ সনে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ করার পর থেকে ভারত যে ইচ্ছাকৃতভাবে পানি সমস্যা সমাধানকল্পে বাংলাদেশের সঙ্গে কোনরূপ দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে পেঁছিতে নারাজ তা বাংলাদেশের অনেকের কাছে স্পষ্ট। অনেকে একে ভারতীয় আধিপত্যবাদী মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে করে। ভারত কর্তৃক একতরফা গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী এলাকা অর্থনৈতিক ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

পানি বন্টন সমস্যা এখন পানির প্রবাহ বৃদ্ধি ও পানির নিয়ন্ত্রণ সমস্যাকে গুরুত্বের দিক থেকে ছাড়িয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে ভারত কর্তৃক ২০০-মাইল দীর্ঘ 'সংযোগ খাল' নির্মাণের প্রস্তাব। ভারতের প্রস্তাবিত এই খাল ব্রহ্মপুত্র নদীকে ফারাক্কার কাছে গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত করবে। কিন্তু বাংলাদেশ ভারতের সংযোগ খালের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এর পরিবর্তে বাংলাদেশ শুকনো মওসুমে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধি কল্পে নেপালে গঙ্গার শাখায় জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব রাখে।

ভারতের সংযোগ খাল নির্মাণ সম্পর্কিত প্রস্তাব বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করে এ কারণে যে, এ ধরনের খাল বাংলাদেশের কৃষিকার্য ও পরিবেশের ওপর দারুণ ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, ঘটাতে পারে উপর্যুপরি বন্যার উপদ্রব, পলিমাটি ও তলানি সঞ্চিত করবে, ক্ষয় করবে মাটি।

সাম্প্রতিককালে ভারত ত্রিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনায় নেপালের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রস্তাবে রাজী হয়েছে বলে মনে হয়; তবু বাংলাদেশ-ভারত পানি হিস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় সৃষ্ট অচলাবস্থা দূর হয়নি। বরং দু'দেশের মধ্যে এ নিয়ে আরো জটিলতার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা তিস্তা, খোয়াই, গোমতী, মুহুরী, মনু ধরলা, দুধকুমার, কুশিয়ারা ও মহানন্দার মতো নদীগুলোতে উজান দেশ ভারত যখন বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করবে তখন ভাটির দেশ বাংলাদেশে এসবের অশুভ প্রভাব হবে প্রায় তাৎক্ষণিক। এ ধরনের উদ্ভূত সমস্যা সমাধানকল্পে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত নদী কমিশন গঠিত হয়, কিন্তু পানি হিস্যার সমাধানে এ কমিশনের সাফল্য অতি তুচ্ছ বলা চলে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বিষিয়ে তুলছে আরো কিছু অমীমাংসিত সমস্যা। এসবের মধ্যে রয়েছে তিন বিঘা ও দক্ষিণ তালপট্টি, উভয় দেশের অভিন্ন সীমান্তে ভারতের প্রস্তাবিত কাঁটাতারের বেড়া, সমুদ্রিক জলসীমা চিহ্নিত করণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে অসমতায় সাম্যবিধান, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর যোগ-সাজস ও সমর্থন পুষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা উপজাতীয় বিদ্রোহীদের সন্ত্রাসী হামলা। এসব বিবদমান বিষয়ের কারণে বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্যবাদ ও কর্তৃত্বসুলভ মনোভাবের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। অনেকে একে পরিহাস মনে করছে যে, যে পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ তিক্তভরে লড়াই করেছিল বর্তমানে ভারতের চেয়ে সেই পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের অধিকতর সুসম্পর্ক লক্ষণীয়,[৩১] যদিও পুরনো পাকিস্তানের সম্পদের হিস্যা এবং পাকিস্তান-পন্থী বিহারীদের পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিবাদ এখনো সম্পূর্ণ অমীমাংসিত।[৩২]

ভারত কেন তিন বিঘা করিডোর ফেরৎ দেয়া এবং চাকমা উপজাতীয় শরণার্থীদের ফিরে আসার ব্যাপারে সরকারী চুক্তি সম্পাদন,

উচ্চ পর্যায়ে নিশ্চয়তা ও সমঝোতা সত্ত্বেও কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না—এতে অনেকে হয়তো আশ্চর্য হতে পারে, কিন্তু এসব বিষয়গুলো ভারতের "আন্তঃনির্ভরশীলতা" রণনীতি এবং কখনো সখনো বাংলাদেশের পাল্টা ভারসাম্যমূলক 'স্বাধীন চেতা' দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণ করা হলে বোঝা কঠিন হবে না যে কি কারণে ভারত তার চুক্তি, নিশ্চয়তা বা সমঝোতা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকছে।

এখন ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক পর্যালোচনা করা যাক। ভারত শ্রীলঙ্কার একমাত্র নিকট প্রতিবেশী। বলা হয় যে, বৃটেনের নিকট আয়ারল্যাণ্ড কিংবা চীনের নিকট ফরমোজা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভারতের নিকট শ্রীলঙ্কাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।[৩৩] ভারতের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত প্রভাব ও বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন কলম্বো মনে করে যে, ঐতিহাসিক রামায়ন যুগ থেকে শ্রীলঙ্কা প্রায় সর্বদা দক্ষিণ ভারত হতে আক্রান্ত হয়। ভারত-ভীতি তাই শ্রীলংকায় প্রায় সর্বদা বর্তমান।[৩৪]

শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক জাতিগত সমস্যার ফলে ভারত-শ্রীলংকা সম্পর্ক কঠোর পরীক্ষার সমুখীন। জুলাই ১৯৮৩-এ শ্রীলঙ্কার সংখ্যা-গরিষ্ঠ সিংহলী ও সংখ্যালঘিষ্ঠ তামিলদের মধ্যে সহিংস দাঙ্গা শুরু হয়। তামিলদের সমান অধিকারের দাবি নিয়ে বিবাদ শুরু হলেও পরে তামিলরা উত্তর শ্রীলঙ্কার জাফনা উপদ্বীপে স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে। এরূপ সহিংসতা ও রাজনৈতিক দাবির প্রতিক্রিয়া খোদ ভারতেও দেখা দেয়। শ্রীলঙ্কার বহু তামিল ভারতে পালিয়ে গিয়ে তামিল নাড়ু রাজ্যে আশ্রয় লাভ করে। সেখানে তারা যুদ্ধ প্রশিক্ষণ লাভ ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও লাভ করে এবং শ্রীলংকায় ফিরে এসে তারা কলম্বো সরকারের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ভারত বারবার প্রকাশ্যে জানায় যে, তামিলদের নিয়ে বিবাদ শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ বিষয়, যদিও ভারত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তামিল গেরিলারা তবু তামিল নাড়ু থেকে শ্রীলঙ্কায় অনুপ্রবেশ অব্যাহত রাখে। ফলে পারস্পরিক ভয়ভীতি ও আশঙ্কার কারণে শ্রীলঙ্কা-ভারত সম্পর্ক অচিরেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের পর্যায় এসে দাঁড়ায়। কলম্বো সহিংস ও অশান্ত তামিলদের তুষ্টি বিধানে আঞ্চলিক, এমনকি অঞ্চলের বাইরের শক্তিগুলোর সক্রিয় সাহায্য কামনা করে।

এ পর্যায়ে কলম্বো ভারতের কৌশলগত তত্ত্বের মর্মে আঘাত হানে, অতিক্রম করে ভারতের "আন্তঃনির্ভরশীলতা" রণনীতির গণ্ডী। শীঘ্রই ভারত সক্রিয় 'মানবিক' আগ্রহের মুখোশ ধরে শ্রীলঙ্কায় অবতীর্ণ হয় ঐতিহাসিক জ্ঞাতিত্বের ভূমিকায়, যে মুখোশ উন্মোচিত হয় তার "ত্রাণ বোট কূটনীতিতে।" পরবর্তীতে একই মুখোশ আরো উদ্ঘাটিত হয় ভারতীয় বিমানের সশস্ত্র প্রহরায় জাফনায় তামিলদের জন্য ভারতের পরিবহন বিমান থেকে ত্রাণ সামগ্রী ফেলার প্রক্রিয়া থেকে। বহির্বিশ্বের নিকট শ্রীলঙ্কার তামিলদের ব্যাপারে ভারত যে কতখানি বিজড়িত ছিল তা' আর গোপন থাকে নি। এসবের চূড়ান্ত পরিণামে ভারত তার কৌশলগত ক্ষমতার দাপটে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ২৯ জুলাই ১৯৮৭তে স্বাক্ষর করে রাজীব-জয়বর্ধনে চুক্তি, যে কারণে এক পর্যবেক্ষক একে অভিহিত করেন "কনের সম্মতি বিহীন বিয়ের আয়োজন রূপে।"[৩৫] এ চুক্তি কতখানি তামিল সমস্যার সমাধান করতে পারবে, সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবে তাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার এবং একই সঙ্গে তুষ্ট করতে পারবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলীদের—একমাত্র সময়ের মাপ-কাঠিতে তা প্রমাণিত হবে। বর্তমানে কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ী ভারত এবং অনিচ্ছাভরে ভারতের হস্তক্ষেপে সম্মত বিপদগ্রস্ত শ্রীলঙ্কা তাদের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতির সমন্বয় করতে পেরে আপাতঃ দৃষ্টিতে সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। অন্ততঃপক্ষে ভারতের জন্য এটা বড় গৌরব ও আত্মতৃপ্তির বিষয়, কেননা ভারত তার 'আন্তঃনির্ভরশীলতা' রণনীতিতে এ ধরনের প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি সমন্বয়ের বিধান বাস্তবায়িত করে। শ্রীলঙ্কায় ভারতের হস্তক্ষেপে অন্যান্য সার্ক-দেশের প্রতিক্রিয়া কি ধরনের? দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর শক্তি একটি প্রতিবেশী স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্তে তারা সচকিত, কেননা এ ধরনের প্রক্রিয়া সেকেলে সম্প্রসারণ-বাদী অভিসন্ধির-ই পরিচায়ক।

প্রকৃত পক্ষে, ভারতের প্রায় সব প্রতিবেশী দেশ অনুভব করে যে, ভারত তাদের সমান অধিকার ভিত্তিক সার্বভৌম দেশ হিসেবে দেখে না। সিকিম ও ভুটান উভয়ে ছিল বৃটিশ ভারতবর্ষের আশ্রিত দেশ; উভয় দেশ যথাক্রমে ১৯৫০ ও ১৯৪৯ সনে স্বাধীন ভারত কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে একই ধরনের ভাগ্যের শিকার হয়।

বরং ভারত এ সময়ে তার আশ্রিত রাজ্য দ্বয়ের ওপর ঔপনিবেশিক আমলের চেয়েও সম্ভবত কঠোরতর শর্তাবলী চাপিয়ে দেয়। এভাবে স্বাধীন ভারত আশ্রিত রাজ্যের অধিকারী এশিয়ার একমাত্র শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। ১৯৭১ সনে অবশ্য ভারত ভূটানের জাতিসংঘ সদস্য পদ লাভে সম্মতি প্রদান করে। সেই সময় থেকে ভুটান তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুকরণে তার জাতীয় সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জনে তৎপর, যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে ভুটান এখনো, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে, ভারতের তদারকী ও সতর্ক প্রহরাধীন। ১৯৭৪ সনে ভারত আশ্রিত দেশ সিকিমকে তার অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে গ্রাস করে। এতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান ও নেপালে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যাবলী নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়।

কৌশলগত অবস্থানের দিক থেকে ভূটান ও নেপাল উভয় হিমালয় রাজ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা দুটি দেশই ভারত ও চীনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভারত তাই এ দু'দেশকে তার নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য বলে মনে করে। নেপাল কখনো কোন বিদেশী শক্তির কর্তৃত্বাধীন ছিল না। স্বাভাবিক কারণে নেপাল তার ভূ-কৌশলগত অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী। কিন্তু নেপালকে অচিরেই ভারতের "আন্তঃনির্ভরশীলতা" রণনীতির আওতায় আসতে হয়। বস্তুত এই রণনীতি মোতাবেক যে কয়টি দক্ষিণ এশীয় দেশকে প্রথমেই ভারতের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি সমন্বয়ের ধারণা গ্রহণ করতে হয় নেপাল তার মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় রণনীতি সন্নিবিষ্ট হয় ১৯৫০-এর তথাকথিত ভারত-নেপাল শান্তি ও বন্ধু প্রতিম চুক্তিতে। এ ধরনের চুক্তির সুযোগ নিয়ে ভারত ১৯৫১ সনে নেপালে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র গঠনে তৎপর হয়। ফলে নেপাল সরকার ভারতীয় স্বার্থোদ্ধারে নেপালের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দায়ে ভারতকে অভিযুক্ত করে। ১৯৬০-এর দশকে ভারত কিছুকালের জন্য তার নিজস্ব সীমানার অভ্যন্তর থেকে নেপালী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নেপালী বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ-মূলক তৎপরতায় ইন্ধন যোগায়। ফলে বেশ কয়েক বছর ভারত নেপাল সম্পর্কে চাপ সৃষ্টি হয়।

দু'দেশের সম্পর্কের এই পটভূমিতে স্বাভাবিক কারণে নেপাল

চায় একটি আঞ্চলিক শক্তিসাম্যের অবস্থা সৃষ্টি করতে, মোকাবেলা করতে প্রয়াসী হয় ভারতের সৃষ্ট চাপের। বিশেষ করে নেপাল চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে সচেষ্ট হয়। নেপালের পররাষ্ট্রনীতিতে এ ধরনের কৌশলগত প্রবণতা ভারত সুনজরে দেখে নি, বরং উদ্বিগ্ন হয়।[৩৬] বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সার্কভুক্ত দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য দেশ কিন্তু চীন-নেপাল সুসম্পর্ক ইতিবাচক বলে মনে করে। কেননা এর ফলে ভারতের চাপ শুধু প্রতিহত হবে না, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় একটি সুস্থ ভাবধারাও সৃষ্টি হতে পারে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পুঞ্জের সমন্বয়ে গঠিত মালদ্বীপও সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের মতো সমান ও সার্বভৌম মর্যাদা সংরক্ষণে ঈর্ষা কাতর। এ কারণে মালদ্বীপ শুধু দক্ষিণ এশিয়ার সব রাষ্ট্রের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয়, এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সব বহিঃশক্তির সঙ্গেও ভারসাম্যমূলক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। সম্ভবত ভারত প্রতিবেশী সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে তার আঞ্চলিক বিবাদে মালদ্বীপকে নিরপেক্ষ দেখতে চায়, কিন্তু ভারতের হস্তক্ষেপমূলক রণনীতি প্রসঙ্গে মালদ্বীপকে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম বলে মনে হয়।

এ পর্যায়ে ভারত ও তার প্রতিবেশীগুলোর সম্পর্কের সাধারণ কৌশলগত ভাবধারা এবং কার্যকর কলাকৌশল সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। নীতিগত পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের সমুখ দেশ হিসেবে একটি বিশ্ব ভূমিকা অর্জনে ভারতীয় অন্বেষা অন্তত আংশিক ভাবে হলেও বাস্তব রূপ লাভ করে। কেননা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব লাভ ও পঞ্চশীলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির প্রবক্তা হিসেবে ভারত তার আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির প্রসার ঘটায়।[৩৭] ভারত এ বিশ্বকে দেখে আদর্শগত ভাবা-বেগ ও দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত একটি সত্তা হিসেবে, আর তাই তার নিজস্ব নমনীয় ও যুক্তিযুক্ত ভাবমূর্তি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়। এ ধরনের ভাবমূর্তি সৃষ্টি করার প্রক্রিয়ায় ভারত যথেষ্ট চাতুর্য ও সূক্ষতার পরিচয় রাখে। আজকাল বিশ্বের অনেকদেশ অন্তত বাহ্যিক বা মুখ রক্ষামূলকভাবে হলেও ভারতের উত্থাপিত নির্জোট ও পঞ্চশীলার মতো নীতি আদর্শের প্রতি সমর্থন প্রদান করে থাকে। তার আঞ্চলিক

কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর অনুকূলে বা তার মহারণনীতি, রণনীতি ও রণকৌশলের প্রয়োগে ভারত একই ধরনের চাল-চাতুর্য প্রদর্শন করে। কেননা ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় গড়ে তোলে দ্বি পাক্ষিক মডেল ভিত্তিক শান্তিপূর্ণ, বন্ধু প্রতিম ও সহযোগিতার সম্পর্ক এবং এ ধরনের সম্পর্ক ভারত গড়ে তোলে "আন্তঃনির্ভরশীলতা" রণনীতি ভিত্তিক চুক্তির মাধ্যমে।

কিন্তু বাহ্যিক আবরণ সত্ত্বেও এ ধরনের ভারতীয় রণনীতি হচ্ছে একক ভারতীয় স্বার্থ বিস্তারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত, পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণ বা উন্নয়নের বিধান এতে নেই। তবু এ জাতীয় রণনীতি প্রসূত চুক্তি ভারত শুধু স্থলভাগ বেষ্টিত হিমালয় রাজ্য ভুটান ও নেপালের সঙ্গে স্বাক্ষর করে নি, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মতো একে অপর থেকে দূর দূরান্তে অবস্থিত ভারতের প্রতিবেশীগুলোর সঙ্গেও নয়াদিল্লী একইরূপ চুক্তি সম্পাদন করে। একজন ভারতীয় বিশ্লেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে, এ সব চুক্তির ফলে ভারত সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে বটে, কিন্তু এতে চুক্তির "আওতাধীন দেশ-গুলোর নিরাপত্তার বিধান শুধু হবে না, ভারতের ছত্রছায়ায় আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সুনিশ্চিত হবে। পাকিস্তানও তার আপন স্বার্থের কারণে শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে একই ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করতে পারে।"[৩৮] কিন্তু সিমলা চুক্তি সত্ত্বেও ভারতীয় ছত্র-ছায়ার প্রতি পাকিস্তানের কোনরূপ অনুরাগ রয়েছে বলে মনে হয় না।

এটা সত্য যে, ভারত নির্জোট বা জোট নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও ধর্মনিরপেক্ষতা, অহিংসা ও অন্যদেশে হস্তক্ষেপ না করা, শান্তি ও বন্ধু প্রতিম বা মৈত্রীভাব সহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বেশ কিছু নীতিসূত্র দ্বারা তার পররাষ্ট্রনীতি ও বৈদেশিক আচরণকে আবেষ্টিত রাখে। কিন্তু এ ধরনের নীতি সূত্রের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন সত্ত্বেও প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রতি ভারতের সাবিক আচরণ এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এমন একটা ধারণা বিরাজ করে যে, ভারত তার আদর্শিক ও ইতিবাচক নীতিসূত্রের আড়ালে আসল উদ্দেশ্যা-বলী গোপন রাখে। ভারতের প্রকৃত রণকৌশল হচ্ছে বিশ্বপর্যায়ে সুযোগের সন্ধান—সুযোগ মতো মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন। আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারত শুধু "আন্তঃনির্ভরশীলতা" রণনীতি ভিত্তিক দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে ক্ষান্ত হচ্ছে না, এর বাস্তব প্রয়োগে সক্রিয় রণকৌশল ও

অবলম্বন করে চলছে। এসবের মধ্যে রয়েছে স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করা ; প্রতিবেশী দেশ গুলোর রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয়া ; ভারতের ছত্রছায়ায় বিদ্রোহমূলক তৎপরতা চালাতে দেয়া, সময়-সুযোগ মতো প্রয়োজন হলে বিদ্রোহীদের অনুকূলে হস্তক্ষেপ করা ; দ্বি পাক্ষিক বিবাদ বা সমস্যার সমাধানে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তি বা সমঝোতায় পেঁছানো কিন্তু ভারতের কৌশল-গত উদ্দেশ্য হাসিলের অনুকূল না হলে এসব বাস্তবায়িত করা থেকে বিরত থাকা ; আঞ্চলিকভাবে সহিংসতায় ইন্ধন যোগানো ; বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চলতি ভারসাম্যহীনতা রক্ষা করে চলা ; আদর্শিকভাবে শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার মতো মুখরোচক প্রচারণা সত্ত্বেও খোদ ভারতে সংখ্যালঘুদের এসব অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ না করা।

এভাবে ভারতের কৌশলগত আদর্শ ও বাস্তব আচরণে দ্বৈত ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত পক্ষে, ভারতের কৌশলগত আচরণ ক্রমশই সেকেলে, ধ্রুপদী বা অপ্রতিসম ভাবধারা পুষ্ট বলে মনে হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের কৌশলগত তত্ত্বের প্রেক্ষাপট এবং এ-অঞ্চলে তার সার্বিক রণনৈতিক আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বাঙ্গালোর সার্ক সম্মেলনে ভারত ও সার্কভুক্ত প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সহ-যোগিতার প্রয়োজনে কৌটিল্যের কলাকৌশল ব্যবহারের প্রতি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুরাগ নিছক নীতিভ্রংশ বলে মনে হয় না।[৩৯]

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এটা যথার্থই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সম্পর্ক কি ধরনের হবে, তার আচরণের ধারা এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করবে দক্ষিণ এশিয়ায় কি সহযোগিতামূলক বিবর্তন ঘটবে, না কি পারস্পরিক ভয়ভীতি জাত বিবদমান কাঠামো এ অঞ্চলের কৌশলগত পরিবেশ দূষিত করতে থাকবে। দক্ষিণ এশিয়ার রণনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, কেন্দ্রস্থ আঞ্চলিক শক্তি ভারতের আগ্রহ এখনো দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিক অপ্রতিসম সম্পর্কে, বহুজাতিক সহযোগিতামূলক প্রতিসম বা আনুভূমিক সম্পর্কে নয়।

বস্তুত, ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রকৃতি, বিশেষ করে পারস্পরিক ভয়ভীতিজাত কারণে আঞ্চলিক সংস্থা

সার্কের ভবিষ্যৎ বানচাল হতে পারে। বর্তমানে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোতে বিরাজমান ধারণা হচ্ছে যে, ভারত তার আঞ্চলিক ও বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আশা-আকাঙ্খা পূরণে কৌশলগত ও কৌশলমূলক অভিসন্ধি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এ ধরনের অবিশ্বাস ও সন্দেহমূলক ধারণা নির্মূল করতে ভারতকে সচেষ্ট হতে হবে। যদি ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর দ্বি-পাক্ষিক রাজনৈতিক সমস্যাদি অমীমাংসিত থাকে তবে বহুজাতিক আঞ্চলিক সংগঠন সার্কের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। ভারত এককভাবে ভয়ভীতির উৎসরূপে চিহ্নিত বলে তার প্রতিবেশী দেশগুলো পাল্টা ভার সাম্যের চাল হিসেবে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য বহিশক্তির মুখাপেক্ষী।

উপযুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উচিত হবে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে তার মনস্তাত্বিক বাধা দূরীভূত করা, অপ্রতিসম প্রভু নয়—প্রতিসম শরিক হিসেবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করা। বর্তমান দ্বন্দ্ব-বিরোধ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ভারত ও সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ সমূহকে ভাবতে হবে সম্ভাব্য উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে, খুঁজতে হবে নতুন উপায়, প্রণয়ন করতে হবে নতুন রণনীতি ও রণকৌশল সমন্বিত নতুন সম্পর্কের কাঠামো। ভারতকে তার স্বীয় স্বার্থ প্রণোদিত আন্তঃনির্ভরশীলতা রণনীতি প্রসূত প্রক্রিয়া পরিহার করে অভিন্ন স্বার্থের উন্নয়নে 'পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরশীলতা রণনীতির মতো বিকল্প পন্থা গ্রহণ সম্পর্কে ভাবতে হবে।

অল্পকথায়, ভারতকে তার কর্তৃত্ব সুলভ ও আধিপত্যবাদী কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে হবে। সুবিশাল ভারতকে তার সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডী পরিত্যাগ করতে হবে, একক আপন স্বার্থ হাসিলের অন্বেষা বাদ দিয়ে ভারতকে ভাবতে হবে ঐতিহ্য দীপ্ত আঞ্চলিক সংহতির কথা, নীতিসূত্র ভিত্তিক শ্লোগানের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আদর্শিক বিশ্বাসযোগ্যতা। শুধুমাত্র তখনি এ অঞ্চলে জনগণের একের সম্পর্কে অপরের ভুলবুঝাবুঝির নিরসনে সূচিত হবে কৌশলগত প্রক্রিয়া, গড়ে উঠবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ভিত্তিক সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক, ভারত স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাভ করবে তার প্রাপ্য আঞ্চলিক মর্যাদা, অর্জন করবে গৌরব মন্ডিত বিশ্ব ভাবমূর্তি। এভাবে ভারত ও প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলোর সম্পর্ক সুসংহত হবে, সুগম হবে আঞ্চলিক ও বিশ্বশান্তির পথ।

তথ্যপঞ্জী

১. রণনৈতিক বা কৌশলগত চিন্তাধারা সম্পর্কিত বিশদ ব্যাখ্যা এবং এর ভিত্তিতে বিশ্লেষণের জন্য দ্রঃ, আবুল কালাম, "ভিয়েতনামের রণাঙ্গন : বিপ্লবী যুদ্ধের কলাকৌশল" (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), অধ্যায় ; একই লেখকের, "রণনৈতিক কাঠামো, সমকালীন বিশ্ব ও দক্ষিণ এশিয়া", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

২. Lt Col. Donald R. Boucom, "Historical Framework for the Concept of Strategy", "*Military Review* (March 1987), পৃঃ ৩

৩. B. H. Liddell-Hart, *Strategy, the Indirect Approach* (London : Faber and Faber, 1967), পৃ: ৮৩৫-৬

৪. সার্ক-এর সাফল্য এখনো কর্মশিবির, সেমিনার, সম্মেলন প্রভৃত কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প পুঁজি বিনিয়োগ ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সার্কের আলোচ্য সূচীতে যথার্থ স্থান পেয়েছে বলে মনে হয় না। সার্ক-এর সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার জন্য দেখুন, Iftekharuzzaman, "The Saarc on the move : time for further flexibility ?" *Holiday* (30 November 1987)

৫. Mohammed Ayoob, "The Primacy of the Political : South Asian Regional Cooperation (SARC) in Comparative Perspective", in M. Abdul Hafiz and Iftekharuzzaman (eds.), *South Asian Regional Cooperation: A Socio-Economic Approach to Peace and Stability* (Dhaka : Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, 1985).

৬. Ali T. Sheikh, "South Asian Regional Cooperation for Peace and Stability, "in Hafiz and Iftekharuzzaman, (eds.), *Ibid*, পৃঃ ২৫ ; Hamid H Kizelbus, "Geopolitical Compulsions in the Strategy for Peace and Security," *Strategic Studies* Vol. *VI*, Nos 2 & 3 (Winter-Spring 1982-1983), পৃঃ ৯৩

৭. Sheikh, "South Asian Regional Cooperation, "প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৬

৮. Emajuddin Ahamad, *A Comparative View : SARC Seeds of Harmony* (Dhaka : University Press Ltd., 1985), পৃঃ ৫-৬

৯. *Aspects of Our Foreign Policy From Speeches and Writings of Indira Gandhi* (New Delhi : An AICC Publication, 1973) পৃঃ ৮৬

১০. Pradyumna L. Karau, "India's Role in Geopolitics," in

K. L. Misra (ed), *Foreign Policy of India: A Book of Readings* (New Delhi : Thomson Press (India) Ltd., 1977) পৃঃ ২

১১. K. R., Narayanan, "New Perspectives in India Foreign Policy", in K. P. Misra (ed.). *Ibid.* পৃঃ ১৭৭

১২. *Prime Minister Rajiv Gandhi : Statements on Foreign Policy. November 1984-April 1985.* (New Delhi : External Publicity Division, Ministry of External Affairs, 1985). পৃঃ ২০ ; also *Prime Minister Rajiv Gandhi : Statements on Foreign Policy May August 1985.* New Delhi : External Publicity Division, Ministry of External Affairs, 1985), পৃ: ৮৪

১৩. Shelton Kodikara, *Strategic Factors in Interstate Relations in South Asia,* (Camberra : Papers or Strategy and Defence, No. 19 ((Canberra : The Stratigic and Defence Studies (entre, The Research School of pacific Studies, The Australian National University, 1979). পৃঃ ৫৬-৬৯

১৪. Seling S. Harrison, "Farning the Flames in South Asia", *Foreign Policy,* No. 45 (Winter 1981-1982), পৃঃ ৯২

১৫. K. Subramanyam, *Bangladesh and Indias Security,* Compiled and Published by Maj-Gen. D. K. Palit (Dehra Dun : Palit and Dutt Publishers. 19'2', পৃঃ ১৪৮

১৬. Lt. Gen. (Rtd.) A. I. Akram, "Security of Small States in South Asian Context," *Regional Studies* Vol. V. No. I (Winter 1986- 1987), পৃঃ ১২

১৭. Mizanur Rahman Shelley, *Emergance of a New Nation in a Multipolar World : Bangladesh* (Dhaka : University Press Ltd., 1979), পৃ: ১১২

১৮. Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Masters* (London : Oxford University Press, 1969), পৃ: ১৩০

১৯. Subramanyam, *Bangladesh and Indias Security,* পৃঃ ১৫৬, ১৭০. ২৩৯

২০. Emajuddin Ahamed, "Bangladesh and Policy of Peace and Non-alignment", in Emajuddin Ahamed (ed.), *Foreign Policy of Bangladesh : A small state's hmperative* (Dhaka : University Press Ltd., 1984). পৃঃ ২৬-২৭

২১. দ্রষ্টব্য, Kodikara, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭
২২. দ্র: Mubashir 'Hasan, "Alternative to Dependence" in Pran Chopra *Future of South Asia* (Dhaka : University Press Ltd., 1986), পৃ: ১০০-১০২
২৩. Subramanyan, *Bangladesh and India's Security*, পৃ: ১৭০
২৪. New York Times-এর প্রতিবেদন (21 February 1983), উল্লেখিত, Shelton Kodikona. "Strategic Dimersions of south Asian Politics : Emerging Trends," A Paper Presented at the Second International Conference on Indian Ocean Studies Perth, Western Australia (Dec. 5-12, 1984), পৃ: ৮
২৫. K. Subramanyam, "Our Nuclear Predicament," *Strategic Analyses*, Vol. ix; No. 7 (October 1985) পৃ: ৬৫৫
২৬. Harrison, "Fanning the Flames in South Asia," প্রাগুক্ত পৃ: ৯২ ; *Prime Minister Ragiv Gandli : Statements of Foreign Policy, November 1984-April 1985* (New Delhi : External Publicity Division, Ministry of External Affairs, 1985), পৃঃ ২১
২৭. Narayanan, "New Perspectives in Indian Foreign Policy", প্রাগুক্ত পৃ: ১৭৭ ; Ahamed, "Bangladesh and Policy of Peace and Won-alignment", প্রাগুক্ত, পৃ: ২২, ২৭
২৮. Dr. S. S. Bindra, *Indo Bangladesh Relations* (New Delhi : Deep and Deep Publishers, 1982), পৃ: ৩৭, ১৩১
২৯. বাংলাদেশ সম্পর্কিত ভারতের পূর্ব পরিকল্পনার কিছুটা আভাস মেলে ভারতীয় রণনীতিক সুব্রামানিয়াম-এর লেখায় Subramanyam, *Bangladesh and India's Security*, পৃঃ ১১৮
৩০. Kodikara, "Strategic Dimensions of South Asian Politics...", প্রাগুক্ত ১৯
৩১. দ্র:, Norman D. Polmer, "India in the International System", in M. S. Rajan and Shivaji Ganguli (eds), *Great Power Relations, World Order and the Third World* (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1981), পৃ: ৩৪৮
৩২. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্র:, Syed Sirajul Islam, "Bangladesh—Pakistan Relations : From Conflict to Cooperation", in Emajuddin Ahamed, *Foreign Policy of Bangladesh : A Small State's Imperative*. (Dhaka : University Press Ltd., 1984), পৃঃ ৫৮-৫৯

৩৩. Ravi Kaul, "The Indian Ocean : A Strategic postune for India", in T. T. Ponlouse, *Indian Ocean Rivalry* (New Delhi : 1974) পৃঃ ৬৬

৩৪. Maj-Gen. Anton Muttukumarn, "View from the Strategic Island of Sri Lanka in Afro-Asian Ocean, of the Strategy for Peace and Security in South Asian", *Strategic Studies*, Vol. *VI*, Nos. 2 and 3 (Winter-Spring, 1982-1983), p. 119; Abdul Hye, Sri Lanka : Is this the Way to Peace," *Holiday* (2 October 1987)

৩৫. Sadek Khan in *Hodiday* (14 August 1987)

৩৬. Prof. Khadya Bhatka Singh, "A Strategic Land-Locked State's View of Peace and Security in South Asia", *Strategic Studies*, Vol. *VI*, Nos. 2 and 3 (Winter-Spring 1982-1983), পৃঃ ১১৫-১১৭; Leo E. Rose and Satish Kumar, "South Asia", in W. J. Feld and G. Boyd (eds), *Comparative Regional Systems* (New York : Perganon Press, 1980), পৃ: ২৪৯

৩৭. Shankar Dayal Sharma, "Foreword", in *Aspects of Our Foreign Policy*, প্রাগুক্ত পৃ: *iii-iv*

৩৮. Narayanan, 'New Perspectives in Indian Foreign Policy", প্রাগুক্ত পৃ: ১১৭

৩৯. দ্র: *Second SAARC Summit, Bangalare, India* (New Delhi : External Publicity Division Ministry of External Affairs, 1987), পৃ: ১